বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ০৯ | সেপ্টেম্বর ২০১৬

আলাপ এর ২৫ বছর

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

উন্নয়নের প্রথম কথা সাক্ষরতা ও দক্ষতা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৫: সংখ্যা ০৯
সেপ্টেম্বর ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
কাজী মোহাম্মদ আবু হাসেম
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

সূচিপত্র

- মূল রচনা : কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম নিরক্ষর কর্মীদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ ৩-৪
- শিক্ষার বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ভাবনা ০৫
- শিশুরা বেড়ে উঠুক বইয়ের ছোঁয়ায় ৬-৭
- এই গল্পের শেষ কোথায় : ছাগলের চালাকি ০৮
- সন্তানের সাহায্যে মায়েরা সাক্ষর হচ্ছেন ০৯
- আমাদের কথা ১০-১১
- আমাদের লেখা ১২-১৩
- কেস স্ট্যাডি: ছেলেই আমার শিক্ষক ১৪
- কেস স্ট্যাডি: মুক্তা এখন নিয়মিত স্কুলে যায় ১৫
- পড়ুয়াদের আঁকা ছবি ১৬

মূল্য: ২০ টাকা

সম্পাদকীয়

পড়ালেখার সুযোগ পেয়ে আরেমা মারমা খুব খুশি। আরতী রাণী নিজের নাম লিখতে পারেন বলে এখন গর্ব অনুভব করেন। সরোয়ারী বেগমও একই কারণে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ফোরকান বেগম খুশি পড়ালেখা করতে পেরে। বর্তমান সংখ্যার ১০ ও ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় তাদের আরো কথা জানতে পারবেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। এবারের সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম নিয়ে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মী আছেন, যারা নিরক্ষর। পড়তে লিখতে জানেন না বলে পিছিয়ে থাকেন তারা। অথচ একটু সুযোগ পেলেই জীবনে আরো উন্নতি করতে পারবেন। এবারের মূল রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। পড়লে বুঝতে পারবেন কেন সুযোগটি দরকার। মিশন দ্বিতীয়বার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত হয়েছেন তারা সকলে এ সুযোগ নিন। নিজেকে সাক্ষর করে তুলুন। অন্যকে এ সুযোগ নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

তবে পড়ালেখার পাশাপাশি কারিগরী দক্ষতাও জরুরি। কারণ আমাদের জমি কম, মানুষ বেশি। অনেকের জমি জমা নেই। তাদের অনেকেই বেকার। তাই আমাদের কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি কাজের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

এ মাসের প্রথম দিকেই কোরবানির ঈদ। আপনাদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই।

ছবি: এডুকেশন সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম
নিরক্ষর কর্মীদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ

শিক্ষা ও সাক্ষরতা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। উন্নতির পথ দেখায়। কিন্তু বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬১ ভাগ। এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা। এ কারণেই বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গরিব। কারণ সাক্ষরতা ও দক্ষতা ছাড়া কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। পড়ালেখা জানা একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে পারে। পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে পড়ালেখা চর্চা পর্যবেক্ষণ করছেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক

সাক্ষরতা ও কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা

সাক্ষর বলতে আমরা কী বুঝি? যার অক্ষর জ্ঞান আছে তিনিই সাক্ষর। যিনি পড়ালেখার দক্ষতাকে জীবন ও জীবিকার কাজে ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই সাক্ষর। আর মানুষকে সাক্ষর করার কার্যক্রমকে বলে সাক্ষরতা। এবার আমরা আলোচনা করব কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা নিয়ে।

'কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম' হলো- নিরক্ষর কর্মীদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ। এটি সাক্ষরতা কর্মসূচি থেকে আলাদা কিছু নয়। এর মাধ্যমে কর্মী বা শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হন। দক্ষতা অর্জন করেন। যেমন- কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, নিরাপত্তা ইত্যাদি। সাক্ষরতা জ্ঞান তাদের কারিগরি ও জীবন দক্ষতায় কৌশলী করে তোলে। এই শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মীদের বাস্তব চাহিদার উপর বেশি জোর দেয়া হয়। এর পরিচালনা ও বিষয়বস্তু খুব নমনীয়। যেমন- সময় ও স্থান কর্মীদের সুবিধা অনুযায়ী ঠিক করা হয়। এখানে একজন শ্রমিক তার কর্মপরিবেশে সাক্ষর হওয়ার সুযোগ পায়। বই পত্র ও পরিবেশ শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। সময়, শিক্ষক ইত্যাদি নির্ধারণে শ্রমিকদের মতামত নেয়া হয়। এ কর্মসূচিতে সাক্ষরতা প্রদান দলভিত্তিক বা শ্রেণিভিত্তিক হয়। তবে কারখানা ব্যবস্থাপক বা মালিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হয়। এছাড়া কারিগরি সহায়তা জন্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি সেবা প্রদানকারীর সহায়তা নেয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রমের লক্ষ্য

নিরক্ষর কর্মী ও শ্রমিকদের সাক্ষরতা প্রদানের কার্যক্রম এটি। এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। মোট কথা নিরক্ষর কর্মী ও শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। যেমন- পড়ালেখা ও হিসাবে দক্ষ করে তোলা। কর্মীর কাজের দক্ষতার সাথে জ্ঞানের সমন্বয় করা। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর নিরাপত্তা ও সচেতনতা তৈরি করা। পাশাপাশি আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থীর ধরন ও শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি

বয়স্ক নিরক্ষর বা স্বল্প সাক্ষর কর্মজীবি এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেন। যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর। বিভিন্ন যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে তাদের নির্বাচন করা হয়। যেমন- কর্মীদের সাক্ষাৎকার, মতামত, মালিকের সাথে আলোচনা ইত্যাদি। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি থাকে। তারা মাসে একবার কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সভা করেন। এখানে শিক্ষার্থীর হাতে কলমে শেখার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এজন্য পড়া চর্চার উপকরণটি সহজভাবে রচিত। যার মাধ্যমে অল্প সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা চর্চা করছে শিক্ষার্থীরা

কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কেন প্রয়োজন

সাক্ষর জ্ঞান আছে যাদের, তারা সহজে কাজের নির্দেশনা বুঝতে পারেন। কাজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তিনি যেমন সাক্ষর হন, তেমনি সচেতন হন। নিরাপত্তা ও সর্তকতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। ফলে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি বেশি হয়। কারখানা বা কোম্পানি ঝুঁকির মধ্যে থাকে না। তারা মানসম্পন্ন কাজ করতে পারেন। যা একটি কারখানা বা কোম্পানিকে উৎপাদন বাড়িয়ে লাভজনক করে তোলে। এক কথায় কারখানা বা কোম্পানীতে সাক্ষরতা কার্যক্রম কর্মীর উন্নয়ন সাধন করে। সেই সাথে কারখানার উৎপাদন বাড়ায়। তাই কল-কারখানার মালিক বা ব্যস্থাপকদের কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ ধরনের উদ্যোগ কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে ভালো ফলাফল আনবে। যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। দেশ নিরক্ষতার অভিশাপমুক্ত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের-কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম

'কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা কার্যক্রম' শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক সবার জন্য এটি একটি সুযোগ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। পড়ালেখার জন্য স্ব-শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর বই সাক্ষরতা -১ ও ২ ব্যবহার করছে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করছে। প্রয়োজনে কারখানা এবং স্থানীয় ও ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য নেয়া হচ্ছে।

শেখ শফিকুর রহমান
কোঅর্ডিনেটর, এমআইএস এন্ড ডকুমেন্টেশন
ডাম-সিএলসি প্রকল্প, ডাম, ঢাকা।

শিক্ষার বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর ভাবনা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষার বিস্তারে কাজ করে গেছেন। রচনাবলী ৮ম খন্ড বইয়ে তিনি বলেছেন, "মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' এ কথাটির উদ্দেশ্য হলো মানুষ হতে হলে পড়ালেখার বিকল্প নাই। কারণ পড়ালেখা জানলে মানুষ ভালো মন্দ বুঝতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনি বইয়ে আরো বলেছেন, 'উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুরাও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে"।

এ কথার অর্থ হলো শিশুকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে তারা পূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে উঠবে। বর্তমান সময়ে যার প্রয়োজন খুবই বেশি। আমাদের সমাজে এখন মূল্যবোধ ও সুশিক্ষার অভাব দেখা দিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করছে। ভাই-ভাইয়ের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, সমাজ সমাজের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। দেশ দেশের প্রতি, জাতি জাতির প্রতি হিংসা ও হানাহানি লেগে আছে। যা আমাদের কারো কাম্য নয়। সমাজে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন সু-শিক্ষা ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিস্তার।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন "গৃহ, বিদ্যালয় ও ধর্মশালা হল শিক্ষার তিনটি স্তর। গৃহই শিক্ষার ভিত্তিস্থান। কেবল গৃহে শিক্ষার পরিপক্কতা জন্মিতে পারে না বলিয়াই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা। একটি অপরটির পরিপূরক। সমাজ ও শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে। যে সমাজ যত উন্নত সে সমাজ তত অনুকূল"। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র "পরীক্ষায় কৃতকার্যতা কোন শিক্ষারই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে"। তাঁর মতে সুশিক্ষা, সুব্যবস্থা ও সুশাসনই একজন শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে ডাম কাজ করছে। ডাম শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছে। যেমন- একদিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। যেমন- উন্নত শিক্ষার সুযোগ, ছাত্র উপযোগী শিক্ষা, আনন্দদায়ক শিক্ষা প্রভৃতি। আসুন, আমরা সবাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) উপদেশ মেনে এগিয়ে যাই। সু-শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা বিস্তারে কাজ করি।

প্রশান্ত ডেভিড সাধুখাঁ
প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ইষ্ট ইউসিএলসি প্রকল্প, ডাম, ঢাকা।

শিশুরা বেড়ে উঠুক বইয়ের ছোঁয়ায়

এডুকেশন সেক্টরের টিম লিডার রিডিং ফর চিলড্রেন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। তাদের এই কল্পনার জগতটি রঙিন ও নির্মল। জন্ম থেকেই শিশুরা নানা কিছু দেখে শুনে ও অনুকরণের মাধ্যমে শিখতে থাকে। শিশুরা পরিবার, প্রকৃতি, পরিবেশ ও তার আশপাশের জগত থেকে ধীরে ধীরে শিখে। ফলে নতুন নতুন প্রশ্ন, কৌতুহল তাদের মনে জন্ম নেয়। শিশুদের এইসব প্রশ্নের সঠিক ধারণা দেয়া প্রয়োজন। তাদের কল্পনার জগতের চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন। এজন্য দরকার ছোটবেলা থেকেই তাদের সহায়তা করা। পাশাপাশি তাদের ভাষা শিক্ষা ও চিন্তায় বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। তাদের সামাজিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করা প্রয়োজন। শিশুর সাথে যত্নকারীর সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো বিবেচনা করে ডাম-শিক্ষা প্রকল্পে 'রিডিং ফর চিলড্রেন' কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কেন এই কর্মসূচি

এ কার্যক্রমে শিশুদের জন্য তাদের বড় বোনেরা যত্নকারীর ভূমিকা পালন করবে। এই কিশোরীরা ভবিষ্যতে একদিন মা হবে। তারা যেন নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি যেন যত্ন নিতে পারে এই বোধ তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। এ প্রক্রিয়ায় সমাজ পাবে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান বিকশিত শিশু।

বর্তমানে প্রাক শৈশব নিয়ে দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। কিন্তু ০১ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ নেই। এই শূন্যতা কিছুটা হলেও পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করছে। কমিউনিটির উদ্যোগে কিশোরীদের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষামূলকভাবে 'রিডিং ফর চিলড্রেন' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

এ কর্মসূচিটি মাধ্যমে শিশুর শব্দ ভান্ডার ও কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। শোনা-বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শব্দ ও বাক্যের সঠিক প্রয়োগে দক্ষ হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। শিশুরা বই পড়া শিখবে। কিশোরীদেরকে ভবিষ্যত দক্ষ মা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

'রিডিং ফর চিলড্রেন' এটি কমিউনিটির উদ্যোগে পরিচালিত একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার ০১ থেকে ০৫ বছর বয়সী শিশুদের সামনে দেখা দিবে নতুন জগত। শিশুদের কাছে রঙিন ছবি যুক্ত গল্পের বইয়ের বিশাল একটি ভান্ডার থাকবে। ফলে শিশুদের পঠন অভ্যাস তৈরি হবে। তাদের

ভাষা, শিক্ষা, চিন্তা, সামাজিক ও আবেগীয়, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। এই কার্যক্রমের শিশুর বড় বোনেরা তাদের বিভিন্ন বই পড়ে শোনাবে। এতে তারাও লাভবান হবে। তাদের সাক্ষরতা চর্চা ও পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

কার্যক্রমটি যেখানে বাস্তবায়ন হচ্ছে

'রিডিং ফর চিলড্রেন' কর্মসূচিটি ৫টি জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১৬টি কেন্দ্র চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে আওতাভুক্ত রয়েছে ০১ থেকে ৫ বছর বয়সী মোট ২৯১ জন শিশু। এছাড়া ১৫০ জন কিশোরী এবং ১৪১ জন মা রয়েছেন। গত মে মাসে ৮০ জন কিশোরীকে কর্মসূচি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

যেভাবে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে

- সপ্তাহে ১দিন ২ ঘণ্টা করে কেন্দ্র পরিচালিত হবে;
- কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বে থাকবেন কিশোরী ভলান্টিয়ার;
- শিশুদেরকে তাদের কিশোরী বোন বা ভলান্টিয়ার যত্ন করবে। নির্বাচিত বই থেকে ছবি দেখাবেন ও গল্প বলবেন।

কিশোরীদের রিডিং ফর চিলড্রেন কর্মসূচি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

কিশোরীগণ শিশুদের গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন

- কেন্দ্র থেকে ভলান্টিয়ার সপ্তাহে ১ দিন বই সংগ্রহ করবেন;
- সিএমসি/জিএমসি সদস্যগণ কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। জনগণকে তারা উদ্বুদ্ধ করবেন;
- ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারগণ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে উদ্বুদ্ধ করবেন;
- কেন্দ্রের লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করতে একটি তহবিল গঠন করা হবে। কমিউনিটি থেকে টাকা সংগ্রহ করে এই তহবিল গড়ে তোলা হবে।

আশা করা যায়, এই কর্মসূচি শিশুর সব ধরনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে শিশু ও যত্নকারীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। কিশোরীগণ ভবিষ্যত মা হলে তাদের সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে। সব থেকে বড় কথা, শিশুরা বইয়ের ছোঁয়ায় বেড়ে উঠবে।

খাদিজুন নাহার স্বপ্না
ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর, ডাম-সিএলসি প্রকল্প

এই গল্পের শেষ কোথায়?

ছাগলের চালাকি

গল্পের আগের অংশের সারসংক্ষেপ: [একদিন এক বাচ্চা ছাগল হাঁটতে হাঁটতে বনের ভিতর হারিয়ে গেল। অন্ধকারে সে এক ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে পড়ল। নেকড়ে তাকে খেতে চাইলে সে বড় প্রাণির লোভ দেখাল। তারপর সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা দিলো। যাওয়ার পথে পুচকে ছাগল জান বাঁচানোর জন্য উপায় ভাবতে লাগল। আর চটাস চটাস- শব্দে ঠোঁট চাটতে লাগল]

ছাগল একটু পর পরই চটাস চটাস করে ঠোঁট চাটতে লাগল। এই শব্দ যত শুনছে ততই যেন নেকড়ের ক্ষুধা বাড়ছে। তাই নেকড়ে আবার শুধায়, কিরে বললি না, কি খাচ্ছিস? ছাগল এবার বলল, শোন মামা আমি যা করছি তুমি তা করতে পারবে না। এবার রীতিমতো রেগে গেল নেকড়ে। এমনিতেই সে ক্ষুধার্ত। হাতের সামনে খাবার থাকার পরও খেতে পারছে না সে। তার উপর হাঁটতে হচ্ছে। আর তারই সামনে কিনা পুচকে ছাগল খাবার খাচ্ছে। আবার বাহাদুরিও দেখাচ্ছে। সে রেগে গরগর করে বলল, 'বলবি কিনা বল? নইলে এখনই ধরে খেয়ে ফেলব তোকে।'

ভয়ে ছাগল ম্যা ম্যা করে বলল, না না খেতে হবে না তোমাকে। আমি ভাবলাম ছোট খাটো পোকা মাকড় খেয়ে তুমি ক্ষুধা নষ্ট করবে কেন? নেকড়ে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই চারিদিকে অনেক পোকা মাকড় উড়ছে। নেকড়ে ছাগলকে বলল, 'কী করে ধরছিসরে তুই?'

ছাগল বলল, 'ধরতে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে না। আমি হা করে হাঁটছি। পোকারা আপনা আপনি মুখে ঢুকে পড়ছে। তবে মামা তুমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে থেকো। অন্ধকারে তোমার চোখ তো আবার জ্বলে। ভয়ে ওরা কাছে আসবে না।'

ছাগলের কথামতো নেকড়ে চোখ বন্ধ করে নিল। এরপর হা করে হাঁটতে লাগল। সামনেই ছিল এক বিশাল গর্ত। চোখ বন্ধ থাকায় নেকড়ে গিয়ে পড়ল সেই গর্তে। রাগে চিৎকার করে উঠল সে। ছাগলকে গালি দিয়ে বলল, 'এখান থেকে এখনি তোল আমায়।' ছাগল বলল, 'মামা, আমি পুচকে ছাগল। কীকরে তোমায় তুলব? অপেক্ষা করো। তোমার মতো বড় বড় প্রাণী ভুল করে এই গর্তে পড়বে। তখন না হয় তাদের ধরে খেয়ে নিও।' এই বলে হাসতে হাসতে ছাগল চলল বাড়ির পথে।

লুৎফুন নাহার তিথি
উপকরণ উন্নয়নবিদ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

সন্তানের সাহায্যে মায়েরা সাক্ষর হচ্ছেন

ছেলের কাছে পড়া শিখছে একজন মা

শিক্ষাই সকল শক্তির মূল। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তাই শিক্ষা হলো উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ১০০ জনের মধ্যে ৩৯ জন মানুষ নিরক্ষর। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ নিরক্ষর মা। মাকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রেখে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। ভবিষ্যত শিশুর নিখুঁত ও মজবুত ভিত গড়তে মায়ের শিক্ষার প্রয়োজন অনেক বেশি।

বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কাজ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। 'মায়ের পড়ালেখা' নামে শুরু করেছে মা সাক্ষরতা অভিযান। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো- নিরক্ষর এবং স্বল্প সাক্ষর মায়েদের পড়ালেখা শিখতে সহায়তা করা। তৃতীয় শ্রেণি বা তার উপরে পড়ুয়া শিশুরা তাদের মাকে 'মায়ের বই' উপহার দিচ্ছে। মাকে পড়ালেখা শিখতে সহায়তা করছে।

সন্তান ও মায়ের মধ্যে এক গভীর ভালবাসা রয়েছে। সেই ভালবাসার বন্ধনেই চালিত হচ্ছে এ অভিযান। ডামের বিভিন্ন প্রকল্পের ২৮টি এলাকাতে এ অভিযানটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ অভিযানের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৩০,৯৯৫ জন মা সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করেছেন।

এ বিষয়ে এলাকার সকল মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে এ অভিযানের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যেমন- জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দৈনিক পত্রিকা, সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদি। এ অভিযান ডাম ছাড়া আরো ৩টি প্রতিষ্ঠানে বিস্তারের প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এ সকল মায়েরা তাদের সন্তানের পড়ালেখায় সহায়তা করতে পারছে। পাশাপাশি পরিবারের উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করেছে। অন্যদিকে এ অভিযানের মাধ্যমে শিশুরা একজন সমাজ কর্মী হিসাবে গড়ে উঠছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভবিষ্যত যাত্রার লক্ষ্য একটি সাক্ষর সমাজ গঠন করা। 'মা সাক্ষরতা অভিযান' সেই লক্ষ্য অর্জনে নতুন উদ্যোগ। আশা করা যায়, মিশনের এ উদ্যোগ শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।

মোঃ সাহিদুল ইসলাম
টিম লিডার, শিক্ষা কর্মসূচি।

আমার পড়ালেখায় আমার স্বামী খুব খুশি

আমি আরতী রানী। আমার বাবা ছিল খুব গরিব। এ কারণে অল্প বয়সেই বিয়ে দেয়। সেজন্য পড়ালেখা করা সম্ভব হয় নি আমার। কিন্তু আমি বুঝেছি পড়ালেখা না জানলে কি সমস্যা হয়। তাই আমি আমার সন্তানদের পড়ালেখা করতে দিয়েছি। তারা সকলে স্কুলে পড়ছে। তাদের জন্য আমিও এখন পড়ালেখা শিখছি। মায়ের বই প্রথম ভাগ শেষ করেছি। দ্বিতীয় ভাগ পড়ছি। বইটি সহজ । পড়তেও খুব ভালো লাগে। আমি এখন সংসারের সব হিসাব করতে পারি। তাই আমার পড়ালেখায় আমার স্বামী খুব খুশি।

আরতী রানী
বাবুইপাড়া গ্রাম, কৈমারী ইউনিয়ন, জলঢাকা উপজেলা
কিউ আই ই এস ডি প্রকল্প, নীলফামারী জেলা।

আমি এখন হিসাবের টাকা গণনা করতে পারি

আমি সারোয়ারি বেগম। আমার বয়স এখন প্রায় ৪৫ বছর। আমার স্বামীর নাম মোঃ আফতাব আলম। দেশ ভাগের পর বাংলাদেশে আটকে পড়ায় শুরু হয় আমার নতুন জীবন। আমি ছিলাম নিরক্ষর। কিন্তু আমার মেয়ে কাজল পড়ালেখা করছে। সে এখন ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। আমি পড়ালেখা জানি না। তাই মেয়ের পড়ালেখায় কোনো সহায়তা করতে পারতাম না। মেয়ে যখন পড়তে বসত, আমি মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। একদিন আমার মেয়ে আমাকে একটি বই দিল। মেয়ের সাহায্যে বইটি পড়তে শুরু করি আমি। আমি আগে ভালো করে বাংলায় কথা বলতে পারতাম না। এখন আমি বাংলায় সুন্দর করে কথা বলতে পারি। ছোট ছোট অঙ্ক করতে পারি। হিসাবের টাকা গণনা করতে পারি।

সারোয়ারি বেগম
আলোর ভূবন ইউসিএলসি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত

আমার নাম আরেমা মারমা। আমিও বরকোলা মারমা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আমার স্বামী একজন জেলে। পাহাড়ী সামাজিক অবস্থার কারণে ছোট বেলায় পড়ালেখা শিখতে পারে নি। আমার মেয়ে তুমাসিং মারমা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম সিএলসির স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার মাধ্যমে মিশন আমাকে পড়ালেখা শেখার জন্য একটি মায়ের বই দেয়। মায়ের বইটি পেয়ে আমি বাংলা পড়তে শিখছি। পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত।

আরেমা মারমা, বরকোলা মারমা পাড়া, রাংগুনিয়া।

আমার মেয়ে আমার চোখে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিল

আমার বাবা ছিল খুব গরিব। অভাবের সংসার। তাছাড়া স্কুল ছিল দূরে। এ কারণে আমার ৮ ভাই বোনের মধ্যে কেউ পড়ালেখা করতে পারি নি। এখন বাড়ির পাশে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্কুল হয়েছে। এখন আমার মেয়েকে বিনা খরচে পড়ালেখা শেখাতে পারছি। শুধু তাই নয়, আমার মেয়ের কাছ থেকে আমিও পড়ালেখা শিখেছি। মেয়ে আমাকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। আমার চোখে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিয়েছে। আমি এখন পড়তে শিখেছি। এই অনুভূতি খুবই সুখের এবং আনন্দের। আমার ইচ্ছা মায়ের পড়ালেখা ২টি বই শেষ করে সেলাই প্রশিক্ষণ নিব। সংসারের কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয় করব। মেয়েকে আরো ভালো করে পড়ালেখা শেখাব।

ফোরকান বেগম
মীরখীল নতুনপাড়া, লোহাগাড়া উপজেলা।

একটি পাখি

একটি পাখি হাসতে জানে
একটি পাখি ভালো,
একটি পাখি বেজায় খুশি
সুখ ভরা তার আলো।

একটি পাখি ভীষণ দুঃখি
একটি পাখি কানা,
একটি পাখি শুধুই কাঁদে
ভাঙা যে তার ডানা।

একটি পাখি হাসি খুশি
কখনও বা দুঃখি
দুঃখের মাঝে সুখ আছে
সেই বড় সুখি।

রবিউল হোসেন রাফি
পর্যায়-স্বাধীন, রোল০০৫
সিএলসি ৫৯, হাঙ্গরকুল
লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

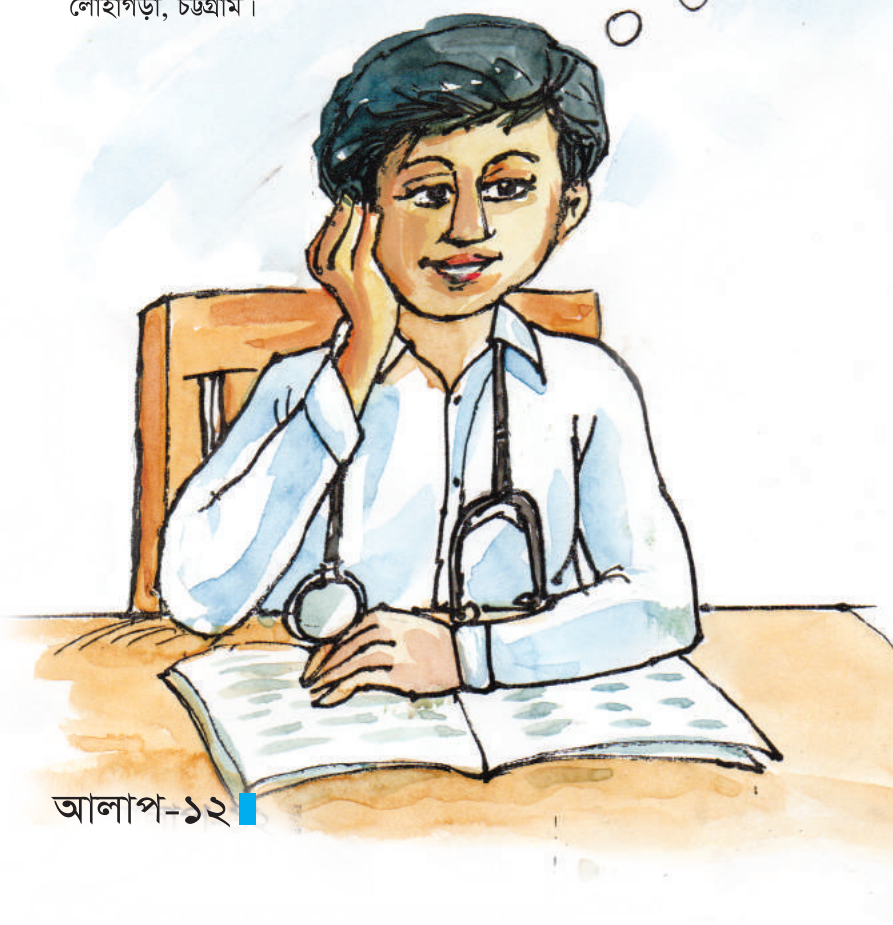

ইচ্ছে জাগে

আমার বড় ইচ্ছা জাগে
ডাক্তার হব আমি,
আপন পর সবার কাছে
হব আমি দামি।

আমার এই স্বপ্নখানি
করতে চাই পূরণ,
সবার সেবা করব আমি
রইব পাশে সারাক্ষণ।

আমার এই আশাটি
হয় যেন পূরণ।

মোঃ এরশাদ
পর্যায়-দক্ষ, রোল-০৭
বড়ুয়া পাড়া শিশু শিখন কেন্দ্র
লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

মা

মা আমার জীবন সাথী,
মা আশার আলো,
মাকে ছাড়া এই দুনিয়ায়
লাগেনাতো ভালো।

মা যে আমার আঁধার রাতে
চাঁদের মতো হাসি,
তাইতো আমি আমার মাকে
খুব যে, ভালোবাসি।

মা আমার এই জীবনে
কোটি টাকার বাড়ি,
মাকে ছেড়ে যাব নাকো
এই দুনিয়া ছাড়ি।

মোঃ আকাশ
শ্রেণি- ৮ম, রোল-০১
জ্যোতি ইউসিএলসি, মিরপুর, ঢাকা।

ঈদের ছন্দ

আকাশেতে উড়ে বেড়ায়
সাদা সাদা বক,
বকের ঠোঁটে আছে লেখা
ঈদ মোবারক।

আলু খেতে বালু বালু
তেঁতুল খেতে টক
সবার সাথে ভাব করতে
আমার বড় শখ।

উঠেছে ঐ ঈদের চাঁদ
আনন্দ হবে খুব,
এই দিনে করব মজা
থাকব না কেউ চুপ।

মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে
দাওয়াত দিলাম আসিতে
থাকব আমরা খুশিতে।

ছুমাইয়া আক্তার
বড়ুয়াপাড়া সিএলসি
লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

কেস স্ট্যাডি

ছেলেই আমার শিক্ষক

নুরন্নাহার বেগম একজন গৃহিণী। বয়স তার ৪০ বছর। চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়ার গাবতল গ্রামে বাড়ি। তার স্বামীর নাম মোঃ জায়দুল ইসলাম। তিনি একজন দিনমজুর। দৈনিক যে টাকা আয় হয়, তা দিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটে তাদের । তাদের প্রথম ছেলে রেজাউল। বয়স ৭ বছর। তারপরও অর্থের অভাবে স্কুলে ভর্তি করতে পারছিল না। এজন্য নুরন্নাহার সারাক্ষণ চিন্তা করত, কী করা যায় এর মাঝে প্রতিবেশির মাধ্যমে একদিন সে জানতে পারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কথা। মিশনের শিশু শিখন কেন্দ্রের কথা। রেজাউলকে সেখানে ভর্তি করা হয়। রেজাউল তারপর থেকে প্রতিদিন সিএলসিতে যায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় আরেকটা। বাড়িতে এসে মায়ের কাছে পড়াগুলো বলতে চায়। কিন্তু নুরন্নাহার নিজের লজ্জার কথা রেজাউলকে বলতে পারে না। ব্যস্ততা দেখিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যায় সে। আর ভাবে, কী করলে এ সমস্যা থেকে বের হতে পারবে।

দেখতে দেখতে ২ বছর পার হয়ে যায়। রেজাউল ৩য় শ্রেণিতে ওঠে। রেজাউল এবার মায়ের সমস্যা কোথায় বুঝতে পারে। মায়ের নিরক্ষরতার কথা আপাকে জানায় সে। সব শুনে সিএলসি'র টিউটর নুরন্নাহারকে মা সাক্ষরতার আওতায় তালিকা ভুক্ত করেন। একটি মায়ের বই দেয়া হয় তাকে। কীভাবে পড়াতে হবে তা রেজাউলকে শিখিয়ে দেন আপা। শুরু হয় ছেলের কাছে নূরন্নাহার বেগমের পড়ালেখা শেখার কাজ। তিনি নিয়মিত রেজাউলের কাছে পড়তে থাকেন। মাঝে মাঝে কেন্দ্রের টিউটর জান্নাত আরা গুলশান খোঁজ খবর নেন। পড়া দেখিয়ে দেন।

নুরন্নাহার বেগম মায়ের বই প্রথম খন্ড শেষ করেছেন। বর্তমানে দ্বিতীয় খন্ডের ১৪ নং পাঠ পড়ছেন। মা সাক্ষরতা অভিযানের আওতায় মায়ের বই পেয়ে তিনি খুব খুশি। লজ্জা ভুলে ছেলের কাছে পড়া শিখছেন। তার কথায় 'ছেলেই আমার শিক্ষক'। তিনি আরো বেশি লেখাপড়া শিখতে চান। পড়ালেখা শিখে জীবনে উন্নতি করতে চান। তিনি এখন বইয়ের পাতায় খোঁজেন, সংসারের আয় কীভাবে বাড়ানো যায়। এজন্য নতুন কী করা যায়।

মোঃ ফারুক হোসেন
ইউনিয়ন সুপারভাইজার, ডাম-সিএলসি প্রকল্প
রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

কেস স্ট্যাডি

মুক্তা এখন নিয়মিত স্কুলে যায়

বরিশাল সদর উপজেলার বরিশাল সদরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম হলো স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ। অন্যান্য স্কুলের মতো এই কার্যক্রম চলছে চক বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। স্কুলটি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত। এই স্কুলেরই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী মুক্তা আক্তার। তার মায়ের নাম শাহীনুর বেগম। পিতার নাম মনির হাওলাদার।

মনির হাওলাদার রসুলপুর ০৯ নং ওয়ার্ডে ব্যবসা করেন। তার দুই সন্তান। তারপরও তার মনে শান্তি ছিল না। কারণটা ছিল তার মেয়ে মুক্তা। মুক্তা তাদের প্রথম সন্তান। মুক্তার মায়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, মুক্তা আগে পড়ালেখা করত না। স্কুলে যেতে চাইত না। সব সময় মন খারাপ করে থাকত। সে শুধু স্কুল পালাত। এর জন্য তাকে অনেক মারধর করা হত। তখন সে ইউসেফ বাংলাদেশ স্কুলে পড়াশুনা করত।

তবে এখন সে আগের চেয়ে অনেক চঞ্চল হয়েছে। কারণ কী? তার মা মুক্তাকে ২০১৪ই সালে ঐ বিদ্যালয় থেকে চকবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। ভর্তি করার পরেই মুক্তার মাঝে এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মুক্তা দেখল, তার নতুন স্কুলে প্রতিদিন বিস্কুট দেয়। তখন থেকেই সে প্রতিদিন স্কুলে আসে। শুধু তাই নয়, এই দেড় বছরে মুক্তা আর স্কুল কামাই করে নাই। তার প্রধান শিক্ষিকা জিন্নাত আরা নবীনাও খুব খুশি। তিনি বলেছেন যে, মুক্তা যখন এই স্কুলে আসে তখন সে ৩য় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ৩য় শ্রেণির ছাত্রী হিসেবে

যতটা জানার কথা ছিল, সে তার কিছুই জানত না। পড়তে পারত না। তবে ভর্তির ২/৩ মাস পরে তার মধ্যে অনেক আগ্রহ দেখা যায়। মনযোগ সহকারে পড়ালেখা করে। প্রতিদিন স্কুলে আসে। তার মধ্যে আর বিষাদ ভাব নেই।' মুক্তার মা বাবা এসে প্রধান শিক্ষিকাকে বলছেন যে, 'আপনাদের এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচি খুবই ভালো। বিস্কুট পেয়ে আমার মেয়েটা পড়ালেখা করতে পারছে। মুক্তার মা বাবা তাই এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এস.এম. রেজাউল করিম
ফিল্ড মনিটর, স্কুল ফিডিং প্রকল্প
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বরিশাল সদর, বরিশাল।

পড়ুয়াদের আঁকা ছবি

ছবি এঁকেছে:
মিনহা
শ্রেণি-১ম, রোল নং-২
স্কুল: প্রীতি
শিশু কিশোর
বিদ্যানিকেতন

ছবি এঁকেছে:
আলিফ
শ্রেণি-শিশু
মালিপাড়া প্রি-স্কুল।

আলাপ পত্রিকা নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission